ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিন

মোস্তাফা জব্বার

প্রেক্ষিত : ১৬ মে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের এক ঐতিহাসিক দিন। এবার সেই দিনটির ২৭ বছর পার করেছি আমরা। ১৯৮৭ সালের এই দিনে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক আনন্দপত্র নামে একটি পত্রিকা, যেটি ছিল বাংলাভাষায় কমপিউটারে কম্পোজ করা প্রথম পত্রিকা। এই দিনটি স্মরণীয়। এরপর বাংলাদেশে ডেস্কটপ প্রকাশনা বিপ্লব হয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই আজকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখছি। এই দিনটির ঠিক একদিন পর বিশ্বজুড়ে বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবস পালিত হয়। এবারও সেটি পালিত হয়েছে। এই দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– টেকসই উন্নয়নের জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট। ২৭ বছর আগে আনন্দপত্র যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল, তারচেয়েও বড় বিপ্লবের নায়ক হচ্ছে ইন্টারনেট। বস্তুত ১৯৯৬ সালের জুনে বাংলাদেশে যখন অনলাইন ইন্টারনেট আসে, তখন ৬৪ কেবিপিএসের একটি ভিস্যাট পেয়েই আমরা খুশিতে আটখানা হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, আমরা তখনও ইন্টারনেটের মজাটাই পাইনি। ২০০৬ সালে সাবমেরিন ক্যাবল আসার পর আমরা ব্রডব্যান্ড নামের এক নতুন ইন্টারনেট অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হই। ২০০৯ সাল থেকে আমরা কার্যত ইন্টারনেট বিপ্লবে শরিক হই। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের ১২ লাখ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এখন চার কোটির কাছাকাছিতে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই চার কোটির প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই ইন্টারনেটের স্বাদ পেলেও ব্রডব্যান্ডের মজা কী তা জানে না। ২০১৩ সালে থ্রিজি চালু হওয়ার পর আমাদের এই বছরের জুন নাগাদ দেশের সব জেলাতেই ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু গ্রামগুলোর অবস্থার কোনো পরিবর্তন আদৌ হবে না। ওখানে ইন্টারনেট সোনার পাথর-বাটি হিসেবেই থেকে যাবে।

অন্যদিকে ১ লাখ ২৭ হাজার টাকার ব্যান্ডউইডথের দাম ২৮০০ টাকাতে নামলেও ব্যবহারকারীর দাম বলতে গেলে আগের মতোই রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে বিটিআরসি মূলত মোবাইল অপারেটরদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে আচরণ করছে। অপারেটরদের কথায় প্যাকেজের দাম ঠিক করে দেয়া হয়, অথচ নিয়মমাফিক কস্ট অ্যানালাইসিস করেই বিটিআরসির দাম ঠিক করার কথা। সেই কাজটি করা হয়নি। সরকারও সেই যে ইন্টারনেটের ওপর ভ্যাট বসিয়েছে, কোনোভাবেই সেটি প্রত্যাহার করছে না। এমনিভাবে ইন্টারনেটের কনটেন্ট ও কনটেন্ট প্রোভাইডারদের জন্য নীতিমালাও বিটিআরসি কোল্ড স্টোরেজে ফেলে রেখেছে। বিটিআরসির তহবিলে ৪০০ কোটি টাকার ইউএসও ফান্ড পড়ে আছে, যা নীতিমালার জন্য এখনও ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

এবার ১৬ মে যখন আমি নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা সদরে উপজেলা ডিজিটাল মেলার স্টলগুলো ঘুরে দেখছিলাম, তখন স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলে ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি সমস্যার কথাই শুনেছি, যার নাম ইন্টারনেট। সবাই একবাক্যে বলেছে, গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেটের গতি নেই এবং ইন্টারনেটের দাম বেশি। বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবসটিকে বিবেচনায় নিয়ে এবার তাই ইন্টারনেট নিয়েই কথা বলতে চাই।

মৌলিক অধিকার ও ভ্যাট : আমাদের দেশের মন্ত্রীরা যেভাবে, যেসব বিষয় নিয়ে, যত ধরনের মন্তব্য করেন, তাতে তাদের প্রশংসা করা বা তাদের মতের সাথে সহমত হওয়া খুব কঠিন কাজ। বর্তমান বা সাবেক সরকারগুলোর মন্ত্রীদের কেউ কেউ এমনসব মন্তব্য করেন, যা মানুষের কাছে অদ্ভুত মনে হয়। অনেকেই মনে করেন, ওরা যদি কম কথা বলেন তবে দেশ ও জাতির অনেক বেশি মঙ্গল হয়। কখনও কখনও মন্ত্রীদের মুখের বাণী অমৃতের মতো প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। তবে কোনো কোনো সময়, কোনো কোনো বিষয়ে কারও কারও বক্তব্যকে শুধু পূর্ণ সমর্থন নয়, ইচ্ছে করে অন্তরের সব শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাটুকু তাকেই দিয়ে দিই। সম্প্রতি এমন কিছু কথা শুনেছি।

গত ৯ এপ্রিল ২০১৪ ঢাকার শান্তিনগরের বিসিএস ল্যাপটপ বাজারের কমপিউটার ও মোবাইল মেলার উদ্বোধনী ভাষণে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু তেমন কিছু কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ইন্টারনেট সবার মানবাধিকার। সংবিধানে মানবাধিকার হিসেবে ইন্টারনেট পাওয়ার অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি ইন্টারনেটের ভ্যাট প্রত্যাহার করার জন্য প্রয়োজনে অর্থমন্ত্রীর পায়ে ধরার ইচ্ছাও পোষণ করেন। যে কাজটি আমি করে আসছি, সেটি করার জন্য আমি আরও একজন মানুষকে পেয়ে খুশি হলাম।

অনুষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকও উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে যারা কথা বলেন, তাদের মাঝে আমিও ছিলাম। আমি ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির ভূমিকা, আমার নিজের সম্পৃক্ততা ও সরকারের সামগ্রিক প্রচেষ্টার প্রশংসাই করেছিলাম। বিশেষ করে গত পাঁচ বছরে সরকার যেমন করে বাংলাদেশের সর্বাঙ্গে ডিজিটাল রূপান্তরের কাজ করে যাচ্ছে, তা অবশ্যই প্রশংসা করার মতো। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথাটিও বলেছিলাম, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সরকার ইন্টারনেটের প্রতি ভালোভাবে নজর দিচ্ছে না। সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে ইন্টারনেটের ওপর ভ্যাট আরোপিত অবস্থা পেয়েছে। খালেদা জিয়ার সরকার সবকিছুর ওপর ভ্যাট দিতে দিতে ইন্টারনেটের ওপরও ভ্যাট দিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেটি প্রত্যাহার করেনি। শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের সরকারও সেই কাজটি করেনি। ইন্টারনেটের ভ্যাটের জন্মলগ্ন তো বটেই, ২০০৮ সালে বিসিএসের সভাপতি হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্টারনেটের ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি করে আসছি, কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেই দাবি আজও পূরণ হয়নি। অর্থমন্ত্রীর সাথে আলোচনায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে বৈঠকে বা বাজেট বিষয়ক অন্যান্য ফোরামে বরাবরই প্রথম দাবি হিসেবে আমি এই ভ্যাটের কথা বলে আসছি। অর্থমন্ত্রী নিজে এর যৌক্তিকতাও মানেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা প্রকাশ্যে ইন্টারনেটের ওপর ভ্যাট না থাকাটাকেই যৌক্তিক মনে করেন। কিন্তু তিনিই বাজেট যখন পেশ করেন, তখন সেই ভ্যাট আর তুলে নেন না। ফলে এখনও আমরা বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট চার্জের ওপর শতকরা ১৫ ভাগ ভ্যাট দিয়ে থাকি। অন্যান্য খাতে ভ্যাটের হারের ক্ষেত্রে সরকার কিছু রেয়াত দিয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার কমানো হয়েছে। কিন্তু ইন্টারনেটের ভ্যাট যা ছিল, তা-ই রয়েছে।

অন্য অনুষ্ঠানের মতো বিসিএস ল্যাপটপ বাজারের সেই অনুষ্ঠানেও আমি ইন্টারনেটের ভ্যাট তুলে নেয়ার দাবি জানাই। আমার পরে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমার দাবি সমর্থন করেন। এর আগেও যখনই আমি ইন্টারনেটের ভ্যাট তুলে নেয়ার দাবি করেছি, যদি সেখানে পলক উপস্থিত থাকতেন, তবে তিনি সেই দাবি সমর্থন করেছেন। তিনি স্বপ্রণোদিত হয়েও এই দাবি তুলেছেন।

আমি বহুবার ইন্টারনেটের ভ্যাট সম্পর্কে অঙ্কের হিসাবও দিয়েছি। নানা সময়ে আমি লিখেছি, মাসে প্রায় ১ কোটি টাকার মতো আয় করার জন্য সরকার ইন্টারনেটের ওপর ভ্যাট চাপিয়ে রেখে সঠিক কাজ করেনি। আমি আমার হিসাবটি আবার এখানে তুলে ধরছি :

সরকার এখন যে ৪৪ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ বিক্রি করে, তাতে প্রতি এমবিপিএস ২৮০০ টাকা হারে আদায় করার পর সাকুল্যে মাসে ১ কোটি ৮৯ লাখ ২৩ হাজার ৫২০ টাকা ভ্যাট পায়। বছরে এই আয়ের পরিমাণ ২২ কোটি ৭০ লাখ ৮২ হাজার ২৪০ টাকা মাত্র। বাস্তবে এই পরিমাণ আরও কম হবে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই ব্যান্ডউইডথের দামের ওপর রেয়াতও রয়েছে। ▶

তবে এই ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও একটি কথা বলা দরকার। ৪৪ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথের সিংহভাগ টেলিকমিউনিকেশন খাতেই ব্যবহার হয়। আমরা টেলিযোগাযোগ খাতের ভ্যাট প্রত্যাহার করতে বলছি না। ফলে যদি সরকার ইন্টারনেটের ভ্যাট পুরোপুরি প্রত্যাহারও করে, তবে বছরে ইন্টারনেট থেকে সরকারের ভ্যাট খাতে রাজস্ব হারাতে হতে পারে বড়জোর ১০ কোটি টাকার। আমি ভাবতেই পারি না, ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণাকারী সরকার কেনো বছরে ১০ কোটি টাকার ভ্যাট প্রত্যাহার করতে পারে না।

স্মরণ করা দরকার, দুনিয়ার সব পণ্ডিতই মনে করেন শতকরা ১০ ভাগ ব্রডব্যান্ড ব্যবহার বাড়লে জাতীয় আয় বাড়ে শতকরা ১.৩৮ ভাগ। আমরা ৫০০ টাকায় ব্যান্ডউইডথের দাম নামিয়ে আনলে ২০১৪ সালেই ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারী অন্তত শতকরা ২০ ভাগ বাড়বে। এর ফলে শতকরা ৬ ভাগ জিডিপি ৮.৭৬ ভাগে প্রবৃদ্ধি পেতে পারে। সরকারের বিবেচনায় থাকা উচিত, বছরে ১০ কোটি টাকার প্রয়োজনীয়তা বেশি, নাকি জিডিপির ২.৭৬ ভাগ প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বেশি। সরকারের অর্থমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন, ব্রডব্যান্ড অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অতিপ্রয়োজনীয়। কিন্তু কোনো বছরেই তিনি ইন্টারনেটের ওপর থেকে ভ্যাট তুলে নেননি।

তথ্যমন্ত্রীর একটি বড় দৃঢ়তা হচ্ছে, এ বিষয়ে তিনি নতুন করে কথা বলা শুরু করেননি। বরং তিনি বরাবরই ইন্টারনেটের প্রসারের কথাই বলে আসছেন। এর আগের সংসদে তিনি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তখনই তিনি ইন্টারনেট বিষয়ে আমাদের দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আসছেন।

অন্যদিকে ইন্টারনেটকে মানবাধিকার হিসেবে দাবি করাটাও যৌক্তিক। আমি অবশ্য একে মানবাধিকার নয়, মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করতে চাই। আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো হচ্ছে– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এর সাথে সভা-সমাবেশ করার বা ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার আমাদের আছে। সাংবিধানিকভাবে দেশের প্রতিটি নাগরিকের এই মৌলিক অধিকারগুলো পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যদিও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বা আমাদের মতো পুজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোতে এসব মৌলিক অধিকারের বিষয়টি রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারে না, তথাপি একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে এসব বিষয়ের স্বীকৃতি রাষ্ট্রের দুর্বলতম নাগরিকের জন্যও একটি আইনগত ভিত্তি রচনা করে। আমরা যখন অন্ন-বস্ত্রের মতো মৌলিক অধিকারের সাথে ইন্টারনেটকে যুক্ত করতে চাই, তখন ইন্টারনেটের গুরুত্বটা অনুভূত হয় এবং মৌলিক অধিকারগুলো না পেলে মানুষের যে বেঁচে থাকা দায় হয়ে যায়, সেটিও প্রকাশিত হয়।

আমাদের মতো দেশেও এখন ইন্টারনেট অতিপ্রয়োজনীয় একটি অনুষঙ্গ হয়ে পড়েছে। অতিসাধারণ মানুষকে এখন তার অতিপ্রয়োজনীয় তথ্য ইন্টারনেট থেকে নিতে হয়। পরীক্ষার ফলাফল, ভর্তি, পাসপোর্ট বা ভিসার আবেদন, চাকরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সনদ, ভোটার তালিকা, সরকারের তথ্য, সরকারি সেবা, বিদেশের তথ্য, আন্তর্জাতিক খবর বা লেখাপড়া; এর কোনোটাই এখন আর ইন্টারনেট ছাড়া সহজে পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে জমির তথ্য, আইন আদালত বা বিচারের তথ্যও ইন্টারনেট থেকে নিতে হবে। এক সময়ে যা কাগজের বিষয় ছিল, এখন সেটি সম্পূর্ণই ইন্টারনেটের বিষয় হয়ে যাচ্ছে।

সাধারণ মানুষের জীবনযাপনেও ইন্টারনেট মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দেশের প্রায় ৪ কোটি (২০১৪ সালের এপ্রিলের হিসাব অনুসারে) ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ১ কোটিই এখন নিজেদের মাঝে সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ফেসবুক ব্যবহার করে। মেইল দেয়া-নেয়া থেকে শুরু করে স্কাইপেতে কথা বলা এখন গ্রামের অতিসাধারণ একজন মানুষের জন্যও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়।

দুনিয়ার সব পণ্ডিতই মনে করেন শতকরা ১০ ভাগ ব্রডব্যান্ড ব্যবহার বাড়লে জাতীয় আয় বাড়ে শতকরা ১.৩৮ ভাগ। আমরা ৫০০ টাকায় ব্যান্ডউইডথের দাম নামিয়ে আনলে ২০১৪ সালেই ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারী অন্তত শতকরা ২০ ভাগ বাড়বে। এর ফলে শতকরা ৬ ভাগ জিডিপি ৮.৭৬ ভাগে প্রবৃদ্ধি পেতে পারে। সরকারের বিবেচনায় থাকা উচিত, বছরে ১০ কোটি টাকার প্রয়োজনীয়তা বেশি, নাকি জিডিপির ২.৭৬ ভাগ প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বেশি। সরকারের অর্থমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন, ব্রডব্যান্ড অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অতিপ্রয়োজনীয়। কিন্তু কোনো বছরেই তিনি ইন্টারনেটের ওপর থেকে ভ্যাট তুলে নেননি।

অন্যদিকে ইন্টারনেট না পাওয়া বা ব্যবহার করতে না পারার খেসারত দিতে হয় ব্যাপকভাবে। আমি এ বিষয়ে একটি অতিসাধারণ দৃষ্টান্ত দিতে পারি। ১৪ সালের মার্চে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, এখন থেকে কাগজের আবেদন নয়, সব মুক্তিযোদ্ধাকে তাদের তথ্য ইন্টারনেটে হালনাগাদ করতে হবে। যেসব সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা এতদিন অতিসাধারণভাবে ভাতা পেয়ে আসছিলেন, তারা অনুভব করলেন ইন্টারনেটে প্রবেশ করে যদি তিনি তার তথ্যগুলো আপডেট করতে না পারেন, তবে তার ভাতা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেই সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে সাইবার ক্যাফেতে ভিড় জমাতে থাকেন।

মালয়েশিয়ায় মানুষ পাঠানোর সময়ও একইভাবে মানুষের ঢল নেমেছিল। ফলে আমরা যে ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত দেখতে চাই, তার জন্য নতুন কোনো যুক্তির প্রয়োজন নেই। আমি মনে করি, ইন্টারনেট পাওয়ার অধিকারকে সংবিধানের পরবর্তী সংশোধনীতে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমি কামনা করব তথ্যমন্ত্রী বা তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বা আরও অনেকে মিলে সংবিধানের এই সংশোধনীর প্রস্তাব করবেন।

অন্যদিকে শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতি নয়, দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে ইন্টারনেট পেতে পারে, তার ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। সরকারের অন্যতম পদক্ষেপ হতে হবে দেশজুড়ে বিনামূল্যের ওয়াইফাই জোন গড়ে তোলা। ঢাকা শহরের ২০টি বাসে ওয়াইফাই গড়ে তোলাটা শুরু হিসেবে প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ১৬ কোটি মানুষের দেশে লাখ লাখ ওয়াইফাই জোন গড়ে না তুললে সাধারণ মানুষের কাছে ইন্টারনেট পৌঁছাবে না। এজন্য দেশের সর্বত্র ইন্টারনেট কভারেজ যেমন থ্রিজি-ফোরজি থাকতে হবে। কমাতে হবে ইন্টারনেট সেবার দাম। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রসার ঘটাতে না পারলে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্নই থেকে যাবে। আমি পূর্বধলার তরুণদের কাছে ইন্টারনেট বিষয়ক যে আকুতি শুনেছি, সেটি বস্তুত পুরো দেশেরই চিত্র।

আমি ২০১১ সালের মার্চ মাসের শুরুতে প্রকাশিত জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করতে পারি, যাতে বলা হয়েছে– ইন্টারনেট একটি মানবাধিকার এবং কাউকে ইন্টারনেট থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। http://www.wired.com/2011/06/internet-a-human-right/ রিপোর্ট থেকে এটি প্রতীয়মান হয়, ইন্টারনেটের অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা বস্তুত তার বাক-ব্যক্তিস্বাধীনতাকে হরণ করা। ২০১০ সালে বিবিসি এক জরিপে জানতে পেরেছে, ২৬টি দেশের শতকরা ৭৯ ভাগ মানুষ ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে। www.theatlantic.com/technology/archive/2011/06/united-nations-declares-internet-access-a-basic-human-right/239911/

যুক্তিসঙ্গত কারণেই ইন্টারনেটকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে গণ্য করার দাবিটি আমরা পূর্ণ সমর্থন করি এবং বাংলাদেশের সংবিধানে এর অন্তর্ভুক্তি দাবি করি। একই সাথে সামনের অর্থবছরের বাজেটে ইন্টারনেটের ওপর থেকে সম্পূর্ণ ভ্যাট প্রত্যাহার দাবি করি। আমি কামনা করব, বিশেষ করে থ্রিজি অপারেটরেরা যাতে ব্যয়ের অনুপাতে মূল্য নির্ধারণ করে, সেজন্য বিটিআরসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। বিটিআরসিতে পড়ে থাকা ভ্যালুএডেড সার্ভিস নীতিমালা চূড়ান্ত করে প্রণীত হবে এবং ইউনিভার্সাল সার্ভিস অবলিগেশন ফান্ড ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলে থ্রিজির প্রসার ঘটাতে হবে কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com